(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলা টাউন সমাচার -৩

কিছু খুচরা টাকা পাঠাতে হবে বাংলাদেশে। মাফ করবেন খুচরা টাকা বলতে আমি বুঝাতে চেয়েছি কম টাকা। যেমন বিশ তিরিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা। যারা খুচরা টাকা নেয় তাদেরকে ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়া যায়। যারা বড় অংকের টাকা নেয় দেশে গেলে তাদের টিকিটি খুজে পাওয়া যায় না। এক আত্নীয়ের প্রয়োজনে কিছু খুচরা টাকা পাঠাব। তিনি এমনভাবে বললেন যেন আমি না থাকলে তার মেয়ের বিয়েই হতনা। সব টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শুধু চল্লিশ হাজার টাকার টান পড়েছে। দুএকদিনের মধ্যে ব্যবস্থা না হলে তার মহাবিপদ। তার এই মহা বিপদ রক্ষা করতে যেতে হবে বাংলা টাউনে আমাদের মানি এক্সেচেঞ্জ এজেন্সিতে। এখন তো অনেকগুলো মানি এক্সেচেঞ্জ। কোনটাতে যাব ভাবছি।
আমাদের প্রয়োজনে দেশে টাকা পাঠানোর কাজটা শুরু করেছিলেন আশরাফ সাহেব এবং সরোয়ার সাহেব। তাদের কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। এখন বৈধ লাইসেন্সধারি অনেকগুলো মানি এক্সেচেঞ্জ আছে। প্রথম লাইসেন্সধারি মানি এক্সেচেঞ্জ হল লোকমান হোসেনের সোনালি এক্সেচেঞ্জ। আগে কি একটা নাম ছিল। শুরু করেছিলেন ১৯৯৫ সালে। এখনও আমাদের সেবাদান করে যাচ্ছেন। অন্যান্য মানি এক্সেচেঞ্জগুলোও সমান তালে আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে দুদিনেই টাকা পোঁছে যায় প্রাপকের হাতে। টাকার মুল্যও প্রতিযোগিতামুলক। গ্রাহককে ধরে রাখার প্রতিযোগিতা।
আমি ঠিক করলাম লোকমান হোসেনের কাছে যাব। আমার অনেক দিনের পরিচিত। অফিসে ঢোকার আগে মনে করলাম একটা সিগারেট টেনে নিই। বাইরে দাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে মলের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে টানছি। তখন এক জোড়া মানব মানবি মানি এক্সেচেঞ্জ অফিস বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসল। কথায় বুঝা গেল তারা স্বামীস্ত্রী। বাইরে এসেই মহিলা রাগে গজ গজ করতে করতে বলল, এতগুলো টাকা পাঠানোর দরকার ছিল?
ভদ্রলোক বললেন, এত কোথায়? এই টাকাগুলো না হলে চলবে কি করে? তাদের তো কোন আয় নেই।
দুজন মানুষের এত টাকা লাগে না। তারা কত সুখে আছে! চাকর বাকর নিয়ে রাজার হালে থাকে! আর এদিকে আমরা কিভাবে টাকা কামাই করি তা জানতেও চায় না। তাদের বুঝার প্রয়োজন নেই। তাদের চাই টাকা। রাতদিন খাটতে খাটতে বুড়া হয়ে গেলাম। তারা দিন দিন জোয়ান হচ্ছে। সারা বছরে একদিন বসে আরাম করতে পারি না। তাদের আরামের শেষ নাই! কম টাকা পাঠালে কম খরচ করবে। আমিও আরাম চাই! আর কাজ করতে পারবনা। তুমি একা কাজ করে সব চালাও!
আরে তুমি এসব কি বলছ? ভদ্রলোক বললেন, বাবার সব জমি বিক্রি করে সব টাকা পয়সা দিয়ে আমাকে বিদেশ পাঠাল। আমি তাদের একমাত্র সন্তান। আমি যদি তাদের জন্য কিছু করতে না পারি তাহলে করবে কে? তাদের তো আর কোন উপায় নেই! তুমি অযথা রাগ করছ। বুঝতে চেষ্টা কর রাবু!
খুব বুঝি, আমাকে কেউ বুঝেনা। তাহলে আমি বুঝতে যাব কেন? দেশে গেলে তো জিজ্ঞেসও করে না আমরা টাকা কিভাবে রোজগার করি! রক্ত পানি করে দৌড়ের উপর কাজ করে টাকা রোজগার করি। সেই টাকা দিয়ে কেউ আরাম করুক তা আমি সহ্য করতে পারি না! তারপর গজ গজ করতে করতে সীমা হন হন করে চলে গেল। ভদ্রলোক তাকে অনুসরন করল।
তারা চলে গেলে আমি ভাবলাম অনেক কথা। রাবুর কথাগুলো কানে বাজছে। কি কথাগুলো বলে গেল? সবই কি অযৌক্তিক?
আমরা যারা স্বাধীনতার পর পরের দেশে নিরুদ্দেশ পাঁড়ি দিয়েছিলাম তারা বর্তমান প্রজন্মের। আমার সন্তানরা পরবর্তি প্রজন্ম। তাহলে আমাদের মাতাপিতারা পুর্ববর্তি প্রজন্মের। আমি বৃদ্ধ বয়সে আমার সন্তানদের উপর নির্ভর করে চলার আশা রাখিনা। বিদেশে আছি বলেই নয়, কর্মজীবন শুরু থেকেই এমন একটা মনোভাব ছিল। আমার পুর্ববর্তি প্রজন্মের মনোভাব তা নয়। তারা সন্তান জন্ম দিয়েই মনে করে যাক, শেষ বয়সে আরাম করার একটা গাছ লাগালাম। আর কোন চিন্তা নেই। তাদের বয়স যখন চল্লিশ হয়ে যায় তখন তারা ইচ্ছে করেই যেন বৃদ্ধ হয়ে যায়। দাড়ি রেখে, মাথায় টুপি দিয়ে নামাজ রোজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকে। সংসারের কোন কাজেই হাত দেয় না। সবকিছু, জমি জমা ব্যবসা সব কিছু ছেড়ে দেয় সন্তানের হাতে। তাদের রিটায়ার করার বয়স হয়না, কিন্তু মনের দিক থেকে তার অকেজো হয়ে পড়ে। সম্পুর্ন নির্ভরশীল হয়ে পরে। তারা বুঝতে চায়না সন্তানের আয় কত, সে আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে তার উপর কোন চাপ পড়ছে কিনা। সে সন্তান দেশেই হোক বা দিদেশেই থাকুক। তারা ভাবতেই পারবে না যে, আজকে যে সন্তানের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে তা তার উদ্দাম যৌবনের আনন্দ ভোগের

ফসল, ভোগ, উপভোগ আর সম্ভোগের ফসল। টাকার গাছ হিসেবে তার জন্ম হয়নি। তার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেয়া যায় না যা সে বহন করতে পারবে না।
রাবুর কথাগুলো সব অযৌক্তিক বলে মনে হল না আমার কাছে। এই প্রবাসে এসে বাংগালি মহিলারা বদলে গেছে। এখানে তারা যে পরিশ্রম করে তা দেখলে অবাক হতে হয়। সামান্য একটা উদাহরন দেয়া যায়। যেমন, রাবুর কথাই ধরা যাক। সে সকাল সাতটা বা আটটায় ঘুম থেকে উঠে, বাচ্চাকে রেডি করে স্কুলে দিয়ে কাজে যায়। কাজ করে একটা ফার্ষ্ট ফুডে। সারাদিন দৌড়ের উপর কাজ করে। বিকেল ছয়টায় ঘরে ফিরে। প্রথমেই রান্নাঘরের হাড়িপাতিল পরিষ্কার করে, বাচ্চাদের হোম ওয়ার্ক কি দেখে, এই ফাকে রান্নার ব্যবস্থা করে ফেলে। বাচ্চাদের হোম ওয়ার্ক শেষ করে রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত নয়টার দিকে রান্না শেষ করে নিজে খায় বাচ্চাদের খাওয়ায়। তখন তার স্বামী ঘরে আসে। তাকে খাবার দিয়ে আধা ঘন্টা টিভি দেখে ঘুমাতে যায়। উঠে সকাল সাতটায়। এই রাবুর টাকা দিয়ে যদি কেউ আরাম করে,তাহলে সে দুএকটা কথা তো বলতেই পারে। তবে আমাদের পুর্ব প্রজন্মের মানুষকে কোনভাবেই কিছু বুঝানো যাবে না। বুঝাতে যাওয়া হবে বোকামি। তারা যে ধারনা নিয়ে আছে সেভাবেই থাকতে দেয়া উচিত আর আমাদের উচিত তাদের কোনভাবে কোন কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। তার জন্য দুএকটা কথা শুনতে হলে কিছু যায় আসে না।
আমরা, বর্তমান প্রজন্ম অবশ্যই পরবর্তি প্রজন্মের উপর নির্ভরশীল হব না। কিন্তু আগলে রাখব।

-o-

বাংলা টাউনে আমি বিনামুল্যে মানুষের সেবা করতাম। প্রায় তিন বছর। ফ্রি সেবা দিয়ে আসছিলাম। বিশ্বাস না হলে চার পাচ বছর আগের পত্রিকাগুলো খোজে দেখুন। পরিষ্কার লেখা ছিল, ফ্রি সার্ভিস, ফ্রি কনসালটেশন। শুধুই মানুষের উপকার করা। আমার ভনিতার পেছনে অন্য কিছু আছে কিনা তা বুঝার অবকাশ নেই। কারন যার সেবা করছি তার কাছ থেকে কিছুই নিচ্ছিনা। কিন্তু তার কাজ করে দিতাম। সেই সেবা করে আমি কিছু পেয়েছিলাম কিনা বা কি পেয়েছিলাম তা সেবা গ্রহনকারির জানার প্রয়োজন নেই। তিনি সেবা পেলেই খুশি।
ফ্রি সেবামুলক ব্যবসা এখন বাংলা টাউনে অনেক। যেমন আপনি বাড়ী কিনতে চাইলে একজন রিয়েল এষ্টেট এজেন্ট ধরতে হবে, তিনি আপনার কাছ থেকে কোন ফি নিবেন না, কিন্তু সেবা দিয়ে দিবেন। বাড়ীর মর্গেজ করতে হলে একজন মর্গেজ ব্রুকারের কাছে যেতে হবে। তিনি খুশিমনে আপনার কাজ করে দিবেন। এমন কি ছয়নয় করে হলেও আপনার কাজটা করে দিবেন। একদম ফ্রি। আপনার জীবনের জন্য বীমা করতে হলে আমাদের যে কোন বীমা এজেন্টকে ফোন করুন। তিনি সাথে সাথে ঘরে চলে আসবেন আপনাকে সেবা করার জন্য। এমন আরও সেবাকর্ম করার সুযোগ আছে। আমি ধরেছিলাম আর, ই, এস, পি-র সেবা। (রেজিষ্টার্ড এডুকেশন স্কুলারশিপ প্রোগ্রাম)। সত্যি, আরইএসপি সন্তানের ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠায় একটি প্রয়োজনিয় এবং লাভজনক বিনিয়োগ। ঠিকভাবে সঠিক সময়ে আরইএসপি শুরু করলে সন্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের জন্য কোন ভাবনা থাকেনা। এতে ফাক ফোকর এমন কিছু নেই। সন্তান হাই স্কুল শেষ করে কলেজে গেলে ঠিক সময়ে ঠিক টাকা পেয়ে যায়। তবে আরইএসপি নেয়ার আগে ব্রোসার খুব ভাল করে দেখে নেয়া ভাল। তাহলে পরবর্তিতে এজেন্টের সাথে গরমিল হয়না।
এই কাজটা ধরেছিলাম, হা, ধরেছিলামই বলব। কারন এই কাজটা একদম সোজা। এর জন্য খুব মুলধন লাগে না। লেখাপড়াও বেশি লাগেনা। শুধু একটা লাইসেন্স নেয়া। লাইসেন্স পেতে খুব কঠিন কিছু নয়। লাইসেন্স পেলে যা লাগে তা হল মুখের জোর। এটাই মুলধন। এ ব্যবসায় ভাল করতে হলে মুখে মধু ঢেলে কথা মালা দিয়ে অক্টোপাশের মত মানুষকে জড়িয়ে ফেলা। এই কায়দাটা জানা থাকলে আর কিছু প্রয়োজন হয়না। ব্যবসায় সফলতা এমনভাবে এসে যায় তখন 'মুই কি হনুরে' একটা ভাব এসে যায়। এমন কিছু মুখ বাংলাটাউনে দেখা যায়।
আমার কায়দা জানা ছিলনা আর মুখেও মধু ছিলনা। একবারে রুক্ষ কথাবার্তা। তাছাড়া আমার প্রতিযোগিদের কিছু নোংরা কাজকর্ম দেখে আমি সিদ্বান্ত নিলাম এই সেবা করা আমার কাজ নয়। তাই বাধ্য হয়ে বসে গেলাম। কিন্তু আমার কিছু গ্রাহক ছিল। এখনও মাঝে মাঝে কারও সাথে দেখা হয়। তেমনি একজনের সাথে দেখা বাংলা টাউনে।
আমাকে দেখেই তিনি একবারে সামনাসামনি এসে দাড়ালেন। মনে হয় এই বুঝি ধরে ফেললেন আর কি! অনেকটা রাগত সুরে বললেন, সাহেব আপনারা পেয়েছেন কি বলুন তো?
আমি তার দুটি বাচ্চার আর ই এস পি করেছিলাম পাঁচ বছর আগে। মনে করলাম বোধ হয় কোন ঝামেলা হয়েছে। ভাবলাম মাসিক ইনস্টলমেন্ট চালু রাখলে কোন ঝামেলা হবার কথা নয়। তাহলে কি হল! জিজ্ঞেস করলাম, কি করলাম ভাই?

আপনি করেন নাই। (যাক বাঁচা গেল!) আপনার মত যারা আর ই এস পি করে তাদের একজন করেছে। লোকটার একটু লজ্জাশরম নেই।
তাহলে আমার উপর ঝালটা ঝারছেন কেন ভাই?
ঝারছি এইজন্য আপনাকে মনের দু:খটা বলতে পারব তাই। আমার স্ত্রীর বাচ্চা হবে, মাস দুয়েক দেরি আছে। তার মাঝেই একদিন লোকটা আমার বাসায় গিয়ে হাজির। বাচ্চার জন্য বেশ কিছু জিনিষ উপহার নিয়ে। তিনি আরইএসপি করেন। তার সাথে আমার এমন কোন সম্পর্কও নেই যে বাসায় গিয়ে উপস্থিত হবে। শুধু বাঙালি হিসাবে মুখচেনা। আমি উপহার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, বাচ্চা তো এখনও জন্মোনি। এত আগেই আপনি উপহার নিয়ে এসেছেন। আমরা তো জানি না ছেলে হবে না মেয়ে হবে। আর আপনার উপহার নিয়ে আসার প্রয়োজন কি?
লোকটা বলল, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক এসব জিনিষ লাগবে তো। আমার এক বন্ধু এসবের ব্যবসা করে। সস্তায় পেলাম। তাই মনে করলাম আপনার তো লাগবে। তাই নিয়ে এলাম।
আপনি জানলেন কিভাবে যে আমার স্ত্রীর বাচ্চা হবে? এসব লাগবে না। নিয়ে যান। বুঝতে পারলাম আরইএসপির ব্যাপার। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। পারলে আমি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেই। তিনি নাছোর বান্দা। জিজ্ঞেস করল, ডেট কবে দিয়েছে।
মাস দুই পর। মাসের নামটা বললাম। তিনি এসব রেখে চলে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন এসব পেয়ে আমি খুব খুশি হব। আমার চেহারা দেখে হয়ত অনুমান করেছে। একটু বসে চলে গেল।
দুই মাস পর বাচ্চা হল। আমরা হাসপাতালে। সবাই ব্যস্ত। দেখি তিনি গিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে হাজির। একটা বড় হাসি দিলে জিজ্ঞেস করল, বাচ্চা ভাল আছে তো?
তাকে দেখেই আমার শরীরে জ্বালা ধরে গেল। অনিচ্ছাকৃতভাবে উত্তর দিলাম। তিনি এদিক সেদিক একটু ঘোরাঘুরি করে বললেন, আচ্ছা, তাহলে এখন আসি। আবার দেখা করব। বাচ্চার আর ই এস পি-টা আমি করে দিব। আমি কোন উত্তর দিলাম না। আরইএসপি করব কিনা তাও ঠিক করিনি। কিন্তু আমি ভাবতে লাগলাম এ লোক জানল কি করে বাচ্চা হয়েছে! পরে জানলাম এই ভদ্রলোকের এজেন্ট আছে প্রতিটি অট্টালিকায়, সব এরিয়াতে। যারই বাচ্চা হবে তার নাম ঠিকানা নিয়ে এই ভদ্রলোককে জানায়। আমাদের বাচ্চার জন্ম খবরটি দেয় আমাদের পাশের বাসার মহিলা। তিনি আমাদের খুব পরিচিত। বাচ্চা হবার পরপরই তাকে জানাই। তিনি একদিন আমাদের বাসায় খাবার পাঠিয়েছেন। যেদিন বাচ্চা হল তার পরদিনই সেই লোক হাসপাতালে গিয়ে হাজির।
এক সপ্তাহ পর তিনি বাসায় ফোন করলেন। বাচ্চার খোজ খবর নিল। তার পরের সপ্তাহে ফোন করে বললেন, আপনার বাচ্চার জন্য আরইএসপির কাগজপত্র নিয়ে আসব কবে?
আমি তো আরইএসপি করব কিনা এখনও ঠিক করিনি। আপনি কাজগপত্র নিয়ে আসবেন কেন। আরইএসপি করলে আপনাকে জানাব।
তিনি বললেন টাকা পয়সার টানাটানি থাকলে বলুন। আমি সহযোগিতা করব। এখন পয়সা দিতে হবে না। আপনি শুধু নামটা রেজিষ্ট্রি করে রাখুন। বাকী যা করার আমি করব।
কি করবেন আপনি?
দুতিন মাস আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আমি চালিয়ে নিব।
মানে? আপনি চালিয়ে নিবেন কথাটা বুঝলাম না। খুলে বলুন।
আগে আপনার সাথে বসতে হবে। আলাপ করার পরই বলতে পারব আমি কয় মাসের বোনাস দিতে পারব।
আরইএসপি করলে বোনাস পাওয়া যায় নাকি?
না, ঠিক তা নয়। শুধু আপনার জন্য এই ব্যবস্থা করব।
তখন আপনার কথা আমার মনে পড়ল। আরে! তিনি তো আমাকে ঠকিয়েছেন! এক পয়সাও তো বোনাস দেননি! আচ্ছা বলুন তো, ভদ্রলোক আমাকে বোনাস দিবে, আপনি দিলেন না কেন?
কারন এমন বোনাসের কোন নিয়ম নেই। যদি কোম্পানী জানতে পারে তাহলে তার লাইসেন্স যাবে, জরিমানা হবে। তিনি কিভাবে কোথা থেকে দিবেন তা আমি বলতে পারব না। আমি এ ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত নই। বা ছিলাম না। তিনি যদি আপনাকে বোনাস দেয় তাহলে তিনি যে কমিশন পাবেন তার থেকে আপনাকে দিতে পারে। আর কোন ব্যবস্থা নেই।
গত পরশু দিন রাতে সব কাগজপত্র নিয়ে বাসায় গিয়ে উপস্থিত। তাকে দেখেই বললাম আমার এখন সময় নেই। আপনি পরে আসুন। আমিই কল দিব। তিনি বললেন, বেশি সময় নিবনা, মাত্র দশ মিনিট।

তিনি কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন মাসে কত টাকা সঞ্চয় করতে চাই। বললাম, এখনও ঠিক করিনি। ঠিক করে আপনাকে জানাব।

তিনি বললেন, ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই। রেজিস্ট্রিটা করে ফেলি। এর মাঝে আপনি মনস্থির করুন। কয়েকটা ফরম সামনে দিয়ে সই করতে বলল। আমি বললাম, মনস্থির করার পরই সই করব। এখন আপনার কাছেই রাখেন। এই বলে তাকে বিদায় দিয়েছি আর মনে মনে আপনাকে খুজছি। আপনার আগের টেলিফোন কাজ করে না। ভালই হল, আপনাকে পেয়ে গেলাম। আপনি এই ব্যবসা ছেড়ে দিলেন কেন?

বললাম, এই কারনেই ছেড়ে দিলাম। এটা নোংরামি। এই নোংরামি আমার দ্বারা হলনা। এসব কাজ করা অনুচিত। যদি অফিস জানতে পারে তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল হবে, প্রয়োজনে জরিমানাও হবে। এই বাংলা টাউনে কারও কারও লাইসেন্স বাতিল হয়েছে এসব নোংরামির জন্য। এসব সেবা দিতে গিয়ে আমরা নির্লজ্জ হয়ে পড়ি, চক্ষুলজ্জাও থাকেনা। যারা সেবা দিয়ে থাকে তাদের নূনতম লজ্জা থাকা উচিত। তাতে যারা এ ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। কিন্তু আরইএসপি সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই কাজটা নোংরা না করেও করা যায়।

-o-

বাংলা টাউনে কিছক্ষন

সেদিন বিকেলে বাংলা টাউনের মারহাবা সুপার মার্কেটের সামনে ট্রাফিক লাইটের নীচে দাড়িয়েছিলাম। থায়রা এভিনিউটা যেখানে ড্যানফোর্থে শেষ হয়েছে, সেখানে। থায়রা এভিনিউটা ছোট্ট একটা পথ। শ'খানেক বাড়ী পরই মাঠে গিয়ে শেষ। মাঠের পর অনেকগুলো আকাশছোয়া অট্টালিকা। বেশিরভাগ এশিয়ানদের বসবাস। এসব অট্টালিকার বাসিন্দারা ড্যানফোর্থে, মলে যেতে এই ছোট্ট পথটা ব্যবহার করে। কারন এটা সর্টকাট। তাই থায়রা এভিনিউ ছোট্ট হলেও সব সময় ব্যস্ত থাকে। দিনে রাতে।

রাস্তার ওপারে বিরাট মল। আমি যাব ডলার ষ্টোরে। অপেক্ষা করছি কখন ওয়াক হবে। আমার পাশে এসে দাড়াল একটি পরিবার। হ্যা, পরিবারই বলব। ভদ্রমহিলার চারটি বাচ্চা। দুটি বসে আছে ট্রলারে, আর দুটি ট্রলারের দুদিকে ধরে আছে। বোধ হয় তারাও যাবে মলে। বাচ্চাকে ধমক দেবার পরই বুঝলাম তারা পাকিস্তানি। ভদ্রমহিলার দেহখানা নাদুস নুদুস। যেন তেল বেয়ে পড়ছে। দেখলে মনে হয় খুব সুখি। বাচ্চাগুলোও বেশ মোটাশোটা। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন এসে জড়ো হল। দেশিবিদেশি। তারাও যাবে ওপারে। আমার পাশ দিয়ে একজন গেল হাতে কয়েকটা পলিথিনের ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে। চেহারা দেখে মনে হল খাস বাঙালি। বোধ হয় আকাশছোয়া অট্টালিকায় বাস। খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলছে। আমার পরিচিত মুস্তফা যাচ্ছে গ্রোসারির দিকে। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? উত্তর দিলাম, ভাল আছি। আমার যত বিপদই থাকুক, যত অসুখই থাকুক ভাল আছি বলতে হবে। এটা নিয়ম। আসলে কি আমি ভাল আছি? কোনদিক দিয়ে আমি ভাল আছি? নিজকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পেলাম না। শুধু আমি কেন? কয়জন মানুষ ভাল আছে? ঠিক তখনই পাশে এসে দাড়াল একজন বাঙালি মহিলা। তার হাত ধরে আছে চার পাচ বছরের একটা ছেলে। তিনি বাচ্চাটাকে বললেন, আমার হাত ধরে রাখ। মহিলার মুখটা শুকনো। চেহারায় একটা চিন্তার ছাপ। ছিমছাম দেহ। মলের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করছে একদল মানুষ। তারা আসবে এপারে। ট্রাফিক লাইট মানুষকে এপার ওপার করে। এক সময় ওয়াক চিহ্ন হল। এপারের মানুষ ওপার গেল, ওপারের মানুষ এপারে।

এর মাঝে আমি আমার 'মাইন্ড চেঞ্জ' করলাম। ওপারে না গিয়ে আমাকে নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমি কেমন আছি! কেন মিথ্যা বললাম! সত্যি বললে কি হত! লাভ লোকশান কিছুই হত না। কিন্তু সত্যি কথাটা বলা হত। আমি একটুও ভাল নেই। না শারিরীক, না মানসিক না অর্থনৈতিক। কোন দিক দিয়েই আমি ভাল নেই। অর্থনৈতিক অংকটা আমার কোনদিনই ভাল অবস্থায় ছিলনা, এখনও নেই। কারন যখনই আমি দেশে যেতে চাই, তখন এই অর্থনৈতিক অঙ্কটা বাধা দেয়। আর যাওয়া হয়না। যখন ইচ্ছে তখন দেশে যেতে না পারলে কোন অংকই ভাল নয়। আমার মত যাকে জিজ্ঞেস করি সবাই বলে ভাল আছে। আসলে কি সবাই ভাল আছে? কারও কারও মুখ দেখলে মনে হয় আসলেও তারা খুব ভাল আছে। কথাবার্তা চালচলেন, বাংলা গ্রোসারিতে বাজার করার নমুনা দেখে মনে হয় তারা সত্যি এত আরাম আশা করেনি। মিলে গেছে এই নাছারার দেশে। অনেক মুখ দেখা যায় একটা অস্থিরতা নিয়ে আছে। শুকনো মুখে একটা চিন্তার ছাপ। অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার ছাপ। বাংলা গ্রোসারিতে কতক্ষন দাড়িয়ে থাকলেই বুঝা যায় কে কেমন আছে।

তাদের বাজার করার নমুনা দেখলেই বুঝা যায় অর্থনৈতিক অংকটা তাদের কেমন চলছে। কেউ আসে কোন দামের দিকে তাকায় না। তাদের যা পছন্দ তাই নিয়ে নেয়। কাউন্টারে গিয়ে পয়সাটা দিয়ে নীরবে চলে যায়। আবার কেউ আছে একটা জিনিষ হাতে নিয়ে রেখে দেয়, কিছুক্ষন চিন্তা করে আবার হাতে নেয়, আবার রেখে দেয়। আট ডলারের ইলিশ তারা খেতে সাহস পায় না। তাদের অংক মিলে না। খুব হিসেব করে বাজার করতে হয়। তারা খোজে কোথায় কখন কি সস্তায় পাওয়া যায়।

তাহলে এখানকার বাসিন্দাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক সুখি মানে অর্থনৈতিকভাবে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে সুখে শান্তিতে আছে আর এক অসুখি মানে অশান্তিতে আছে। অর্থনৈতিক, মানসিক এবং পারিবারিক অশান্তি। অনেকেই আছে ছেলে মেয়ে নিয়ে অশান্তিতে আছে, কেউ আছে ঘর সামলানোর হিসাব নিয়ে। অনেক দিকে দিয়েই অশান্তি হতে পারে। যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে তারা অনেকেই বেশি অশান্তি নিয়ে দিন পার করছে। সন্তান জন্ম দিয়ে লালন পালন করেছে অনেক আশা নিয়ে। এই সন্তান বড় হয়ে ভাল কাজ করবে, সংসারে সব দায়ীত্ব নিবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কোন অংকই মিলেনি। আশায় গুড়েবালি। এসব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে মলে না গিয়ে রওয়ানা দিলাম বাংলা গ্রোসারির দিকে।

মুখ ফিরাতেই দেখি মনিরুল সামনে। সালাম দিয়ে বলল, দৌড়ের উপর আছি। দাড়াবার সময় নাই। কাজে দেরি হয়ে যাবে। বলে হন হন করে চলে গেল। এমন সময় থায়রা ইভিনিউ ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে এল সেই লোকটা। এই লোকটা আমার চেনা, কিন্তু নাম জানিনা, কোনদিন আলাপও হয়নি। তারপরও আমি লোকটাকে চিনি। বয়স চল্লিশের উপর হবে। তেল তেলে চেহারা। তবে খুব নাদুস নয়। সুখি মানুষের চেহারা দেখলেই বুঝা যায়। প্রায়ই তাকে পথে দেখি। সে প্রতিদিন হাটে। সময়ে অসময়ে। বোধ হয় ডায়াবেটিস আছে। তাই হাটে, দেখা হয়। সে হাটে নৃত্যের তালে, হেলে দুলে। সামনের দিকে একটু ঝুকে, হাতগুলো ছেড়ে দিয়ে, মনে হয় তার তুলনায় হাতগুলো লম্বা, ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজির মত। প্রতিটি পদক্ষেপ একটু চাপ দিয়ে, যেন একটা সুখের চিহ্ন রেখে যায়। মনে হয় মাটিতে কিছু আছে যা সে গুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। থাকে আমি যে অট্টালিকায় থাকি সেখানেই। প্রায় প্রতিদিন ইলেভেটরে বা লবিতে দেখা হয়। বাংলায় কথা বলতে শুনেছি। তিনি খুব একটা গম্ভীর ভাব নিয়ে থাকেন বলে কথা হয়নি। আমি যেমন বেকার, তিনিও বোধ হয় বেকার। কিন্তু আমি তো বৃদ্ধ, কাজ করতে অসমর্থ, তাই বেকার। এই লোকটাও কি অসমর্থ? চেহারা দেখে তো মনে হয়না। প্রায় একই পোষাকে দেখি। মাঝে মাঝে মাঠের পাশ দিয়ে আসাযাওয়ার সময় দেখি পার্কের বেঞ্চে বসে ভদ্রলোক প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন, বা হাওয়া খাচ্ছেন। কারও সাথে কথা বলেন না, বা ফিরে তাকান না। মনে হয় সব সময় কোন একটা হিসেব কষছেন মনে মনে। তার কোন তাড়া নেই। যেন সময় পার করা। আমার পাশ দিয়ে, আমার দিকে না তাকিয়ে বাংলা টাউনের দিকে চলে গেল।

একটু যেতেই দেখলাম লোকটার সাথে সালাম বিনিময় করল রফিক। রফিক এদেশে আছে অনেক দিন। কাজ করে একটা বড় হোটেলে। বছরে এক দেড় লাখ ডলার কামায়। আমার সামনে এসেই সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল সেই পুরনো প্রশ্ন: কেমন আছেন। আবার আমাকে মিথ্যা বলতে হল, ভাল আছি। জিজ্ঞেস করলাম, এই মাত্র যে ভদ্রলোকের সাথে তোমার দেখা হল, তিনি কে?

ও, উনাকে চিনেন না? <u>উনি করম আলী</u> সাহেব। বিরাট বিজনেস ছিল, রেন্ট-এ-কার, গার্মেন্টস, অটো ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কয়েকটা ব্যবসা। সব লোকশান দিয়ে এখন ঘরে বসা। কিছুই করে না। ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে সবগুলো ব্যবসা লোকশান হল?

এসব বুঝবেন না। অনেক হিসাব আছে। তাও আবার সবগুলো ব্যবসা একই সাথে বন্ধ হয়ে গেল। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। কেউ বলে তিনি লক্ষ লক্ষ ডলার লোন নিয়ে ব্যাংক্রাপট হয়েছেন, কেউ বলে বিক্রি করে দিয়েছেন এমন অনেক গল্প। আসলে কোনটা সত্য কেউ জানে না। আমার আবার তাড়া আছে বলে রফিক চলে গেল।

সে চলে গেলে আমি আবার দাড়িয়ে পড়লাম। মনিরুলের সাথে এই লোকটার তুলনা করলাম। মনিরুলের সময় নেই, আর এই লোকটার সময় শেষ হয় না। এবার আমার কাছে পরিষ্কার হল লোকটার হাতে এত সময় কেন? রোজগারের উৎসটা কি? আসলে আমি বোধ হয় সুস্থ নেই। না হয় পরের ব্যাপারে মাথা ঘামায় কেউ? এটা সম্পুর্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার এসব নিয়ে ভাবার কোন কারন নেই।

আবার ভাবলাম অন্য কথা। এসব ছোটখাটো ব্যক্তিগত খবর দিয়েই সমষ্টিগত একটা বিষয় ঠিকভাবে জানা যায়। গভীরে প্রবেশ করা যায়। জানা যায় অনেক কথা। মনিরুল আর ঐ লোকটার মাঝে তুলনা করলে দেখা যায় একজনের হাতে সময় নেই, আর একজনের হাতে এত অঢেল সময় তা আর কাটতে চায় না। একজন দৌড়ের উপর আছে সংসারের খরচ যোগাতে আর একজন হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। এসব নিয়ে ভাবা আমার কাজ নয় বলে পা বাড়ালাম বাংলা টাউনের দিকে।

এসময় মারহাবা গ্রোসারী থেকে বের হয়ে এল একজন বাঙালি। নাম জানি না, না কথাটা ঠিক হল না। তিনি নাম বলেছিলেন, আমার মনে নেই। কয়েক বছর আগে, তখনও বায়তুল আমান মসজিদ হয়নি, এই ভদ্রলোক মসজিদের দাওয়াত দিতেন এবং সাহায্য তুলতেন। কোন এক অট্টালিকার একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে মসজিদ করেছেন। তার ভাড়া এবং অন্যান্য খরচের জন্য সাহায্য নিতেন। প্রায়ই আমি যে দালানে থাকি তার লবিতে তাকে দেখা যেত। সালাম দিয়ে হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে নামাজ রোজার উপদেশ দিত, মসজিদের জন্য সাহায্য করলে কি কি ফজিলত তা বয়ান করতেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উনার সাথে কয়েকবার বুকে বুক মিলাবার। তিনি কোথায় থাকতেন বা এখন কোথায় আছে জানি না। তবে মসজিদ হয়ে যাবার পর বুক মিলাবার সুযোগ হয়নি। দুর থেকে বায়তুল আমানের আশে পাশে দেখেছি, এবং বাঙালি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেখেছি সাহায্যের মেমো বই হাতে। এখন উন্নতি হয়েছে। খালি হাতে নয়, কেশ মেমো হাতে নিয়ে সাহায্য তুলছেন। আগের চেয়ে দাড়ীর পরিধি বেড়েছে। এখন বুক পর্যন্ত নেমে গেছে। শরীরখানা সেই পাকিস্তানি মহিলার মত নাদুস নুদুস। মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় টুপি। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবী। হাতে কয়েকটা বেগ। সবকটি নিয়ে হাটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। দেখলাম সামনেই গাড়িতে নিয়ে বেগগুলো রেখে আবার ফিরে গেল। ফিরে এল আরও কয়েকটা বেগ নিয়ে সাথে গ্রোসারির একজন কর্মচারির মাথায় দুটো বস্তা। গাড়ীতে সব লোড করে চলে গেলেন। যেভাবে চলে গেলেন মনে হল হাতে সময় কম।

ভদ্রলোক চলে গেলে আবার আমার মাথায় পরের চিন্তা কিলবিল করতে লাগল। ভাবলাম এই ভদ্রলোক করেটা কি? বাজার করার ধরন দেখে তো মনে হয় খুব আরামেই আছে। যখন তখন তো বাংলা টাউনে দেখি মেমো বই হাতে। তাহলে সংসার চালাবার টাকা আসে কোথা থেকে? যদি তিনি মসজিদের খেদমত করেন তাহলে বেতন বা হাদিয়া পায় কি? কিন্তু যতদুর জানি মসজিদের কোন কর্মচারি নেই। বেতন বা হাদিয়া কিছুই দেয়া হয় না। তাহলে?

ধুত্যুরিকা! এসব নিয়ে আর চিন্তা করব না। একদম বাদ। নিজের চিন্তা করি এখন।

এবার চলতে লাগলাম। ঘরোয়ার সামনে এসে দেখি আকমল সাহেব তাঁর হুইল চেয়ারে বসে রেষ্টুরেন্টের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন যেন তিনি কারও অপেক্ষা করছেন। আমি সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনার শরীরটা কেমন আছে?

আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনতে চেষ্টা করলেন। বললেন, না, খুব পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। যে কয়দিন বেঁচে আছি এভাবেই চলতে হবে।

আপনি কি কারও অপেক্ষা করছেন?

হ্যা, আলম বলল একটু অপেক্ষা করতে। বুঝতে পারলাম আলম মানে ঘরোয়ার কর্নধার সামসুল আলম।

মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক দিন থেকে অনেক রোগে ভুগছেন। বাম হাতটা অবশ। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো বাকাঁ হয়ে গেছে। হাতে নিয়ে কিছু খেতে পারেন না। চামচ দিয়ে খুব সাবধানে মুখে দিতে হয়, না হয় এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। দাড়াতে পারেন না, কোমড়ের নীচে থেকে অবশ হয়ে আছে। পায়ে শক্তি নেই। একটা হাত দিয়েই সব করতে হয়। তিনি প্রায়ই এখানে আলম ভাইর কাছে আসেন। একটু খাবারের জন্য আর একটু বাংলায় কথা বলার জন্য। এই কথিত স্বর্গরাজ্যে খাবারের কত অভাব আকমল সাহেব হারে হারে টের পেয়েছেন। এক মুঠো ভাত আর একটু ডাল খাওয়ার জন্য তিনি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ২৫ কিলোমিটার দুর থেকে আসেন আলম ভাইর এখানে। যতক্ষন সম্ভব তিনি এখানে সময় কাটান।

ভদ্রলোকের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল এই আলম ভাইর ভিডিওর দোকানে। ঘরোয়ার পেছনে ছোট্ট একটা রুমে তার ভিডিওর দোকান। একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি হুইল চেয়ারে বসা একজন বৃদ্ধ মানুষকে মুখে ভাত তুলে দিচ্ছেন আলাম ভাই । আমি মনে করলাম বোধ হয় আলমের কোন নিকট আত্মীয়। না হয় এমন দরদ দিয়ে কেউ কাউকে ডাল ভাত মাখিয়ে মুখে তোলে দেয় না। আমি দাড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোক তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে আর তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। হুইল চেয়ারে বসা দেখে আমি ধরে নিলাম ভদ্রলোক খুবই অসুস্থ। তাই তাকে মুখে তোলে খাওয়াতে হয়। হয়ত আলম ভাইর বাবা হবে। ভদ্রলোকের চোখের জল দেখে মনে করলাম এটাও বোধ তার রোগের একটা। নীরবতা ভঙ্গ করে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আলম, তুমি বুঝি আমার আর একটা ছেলে! তিনি তুতলিয়ে তুতলিয়ে কথা বলছেন। কথা পরিষ্কার নয়, মুখে আটকে থাকে। একটু একটু থেমে থেমে বলতে লাগলেন, আমাকে এত আদর যত্ন করে কেউ কোনদিন এক মুঠো ভাত দেয়নি। আমার কোন ছেলে মেয়ে তো নয়ই এমন কি আমার স্ত্রীও না। নিয়তি বোধ হয় আমার ভাগ্যে এই লিখেছিল, শেষ বয়সে তোমার হাতের সেবা পাবার। কোথাকার কে! আমি তোমার কেউ নই তারপরও তুমি আমার জন্য যা করছ তা কোনদিন কল্পনা করিনি। দেখ, আমার চোখে কি আনন্দাশ্রু!

তখনই বুঝতে পারলাম তিনি আলমের পিতা নন বা আত্মীয় নন এবং চোখের জল কোন রোগ নয়। তৃপ্তি সুখের এ জল। মানুষ অতি দুখে হঠাৎ সুখ পেয়ে গেলে তার আনন্দ প্রকাশ হয় চোখের জলে।
আমি কোন কথা না বলে চুপ চাপ বসে রইলাম। ভদ্রলোকের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আলম তার মুখ ধুয়ে একটা টিসু পেপার দিয়ে মুছে দিল। সোজা করে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার আর কিছু লাগবে?
(চলবে)